আজকের কাগজ
32
তারিখ 03 JUL 1992 পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে গোলাগুলির মাঝে

মোয়াজ্জেম হোসেন : "সাব মেশিনগান হাতে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় ছেলেটা। উঁকি দিয়ে দেখে নেয় সামনে প্রতিপক্ষের অবস্থান। তারপর এসএমজি'র চকচকে নল ধীরে ধীরে তুলে আনে চোখের সমান্তরালে। আই সাইটে চোখ রেখে আস্তে-আস্তে চাপ দেয় ট্রিগারে। গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যায়। পোড়া বারুদের গন্ধ এসে লাগে নাকে।

ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকে বিপরীত দিক থেকেও। মাঝে মাঝে বোমা ফাটার শব্দ। গুলি আর বোমার শব্দে মাথার উপর মনে হচ্ছে যেন নরক ভেঙে পড়ছে।

দশ গজ দূরে অটোমেটিক কারবাইন হাতে তরুণটি ক্রলিং করে সামনে যেতে থাকে। সরীসৃপের মতো তার শরীর মাটির উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। তারপর থেমে গুলিবর্ষণ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে। চারপাশের সহযোদ্ধাদের হাতের ইশারায় সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। পেছন থেকে সমর্থকদের উল্লাসধ্বনি শোনা যায়।

চেহারা আড়াল করার জন্য মুখের উপর কালো রুমাল বাঁধা তরুণ দুহাতে পিস্তল ধরে শোয়া অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দ্রুত ছুটে যায় সামনে। তারপর আবার শুয়ে পড়ে মাটিতে।'

এ কোন বিদেশী থ্রিলার ছবির দৃশ্য নয়। আফগান রণাঙ্গন বা বৈরুতের রাস্তায় যুদ্ধের চিত্রও নয়। এ দৃশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের। মাঝে-মধ্যেই ক্যাম্পাস পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র নিয়ে ছাত্ররা পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। মরণপণ যেসব লড়াইয়ে খরচ হয় হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি। ব্যবহৃত হয় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। বারুদের গন্ধ আর টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় ক্যাম্পাসের চারদিক। ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতাকে ছাপিয়ে শোনা যায় আহতদের আর্ত চিৎকার। নিহতদের স্বজনদের আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে ক্যাম্পাসের বাতাস। ক্যাম্পাসে কখন সংঘর্ষ বাধবে তার পূর্বাভাস দেয়া সত্যিই কঠিন। সকালের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন প্রাণচঞ্চল ক্যাম্পাস দুপুরের আগেই পরিণত হতে পারে রণক্ষেত্রে। একটু আগেও হয়তো যে ক্যাম্পাস ছিল প্রাণোচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের কলহাস্যে মুখর, খানিক পরেই তা প্রকম্পিত হতে পারে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে। যে গাছের ছায়ায় একটু আগে ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের জমজমাট আড্ডা সেই গাছের আড়ালেই হয়তো এখন বন্দুকধারী আততায়ীর অবস্থান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আসা ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম প্রথম সিনেমার পর্দার যুদ্ধ দৃশ্য চোখের সামনে বাস্তবে ঘটতে দেখে ভয়ে উত্তেজনায় শিহরিত হয়। পরে ফিকে হয়ে আসে রোমাঞ্চ। সন্ত্রাসের বলি হয়ে সহপাঠীকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখে বাড়ে ক্ষোভ আর হতাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়ানোর অভিজ্ঞতা কমবেশী সব ছাত্র-ছাত্রীরই আছে। ক্রস ফায়ারে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে এমন ঘটনাও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র হামিদুর রহমান তার এমনি এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বললেন সেদিন :

১৪ মার্চ, ৯২। সকালে হল থেকে বেরিয়ে কলাভবনের দিকে যাচ্ছি। রাজুর শোক মিছিলে যোগ দেব। রাজু, মঈন হোসেন রাজু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক মেধাবী ছাত্র আগের দিন প্রাণ দিয়েছে সন্ত্রাসীদের গুলিতে। অবিশ্রান্ত গোলাগুলির মধ্যে সন্ত্রাস বিরোধী এক মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে রাজু নিহত হয়। বন্দুকধারীদের অব্যর্থ গুলি ছিনিয়ে নেয় রাজুরপ্রাণ।

টিএসসিতে যেদিন রাজু মারা যায়, সেদিন বিকালে আমিও টিএসসিতে ছিলাম। প্রতিদিনের মতো সেদিন বিকালেও টিএসসির চারদিকে সংস্কৃতিকর্মী নাট্যকর্মীদের জমজমাট আড্ডা। ভেতরে নাটকের মহড়া চলছে। বাইরে প্রাচীর ঘেঁষে চায়ের দোকানগুলো ঘিরে তরুণদের জটলা। সড়ক দ্বীপ, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হলের সামনে প্রতিদিনের মতো সেদিনও শত শত ছেলেমেয়ের সমাবেশ। হাঁটছে, গল্প করছে।

এই প্রাণবন্ত, কলহাস্যমুখর পরিবেশ বিদীর্ণ করে আচমকা শোনা গেল গুলির শব্দ। কেঁপে উঠলো গোধূলি লগ্নের ক্যাম্পাস : কয়েকদিন থেকেই দুই ছাত্র সংগঠনের ছেলেদের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। দল বেঁধে সশস্ত্র তরুণরা ক্যাম্পাসে মহড়া দিচ্ছে। সবার মধ্যেই আশংকা কখন সংঘর্ষ লাগে। তার মধ্যেও ক্যাম্পাসের জীবন থেমে থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই চলে সবকিছু।

হঠাৎ গোলাগুলির শব্দে টিএসসির জমজমাট আনন্দঘন পরিবেশ মুহূর্তে পরিণত হয় বিভীষিকায়। চারদিকে আতংকিত ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটাছুটি। গুলি থেকে বাঁচার জন্য কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। প্রাণভয়ে ছুটতে গিয়ে কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাস্তায়। একটু আগেও যেখানে ছিল শত শত ছেলেমেয়ের সরব উপস্থিতি, মুহূর্তের মধ্যে তা হয়ে পড়ে জনশূন্য। গোলাগুলির মধ্যেই আমি দৌড়ে ঢুকে পড়ি টিএসসির ভেতরে। কয়েকশ ছেলেমেয়ে তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মূল ফটকের উপর। সবাই এক সঙ্গে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। আতংকিত মেয়েদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কোন রকমে ঠেলে ধাক্কাধাক্কি করে ভেতরে ঢুকি। নাটকের মহড়া বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু গোলাগুলির শব্দ। কৌতূহলী কেউ কেউ উঁকি দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করে। গোলাগুলির কারণে অনেকেই ভেতরে আটকে পড়েছে। বাইরে যেতে পারছে না। হলের অনেক ছাত্রীও রয়েছে তাদের মধ্যে। হল গেট বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যায়, কিন্তু গোলাগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তো বেরোবার উপায় নেই। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে গোলাগুলি কিছুটা কমে আসে। আর তার মধ্যেই শোনা যায় স্লোগানের শব্দ। কিছু ছাত্র সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল বের করেছে। মিছিলের স্লোগান অনেকের মনে সাহস ফিরিয়ে আনে, একজন দুজন করে বাইরে বেরুতে থাকে। আমিও বেরিয়ে আসি বাইরে। ঠিক তখনই আবার গুলির শব্দ। আবার দৌড়াদৌড়ি, ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার। কিছুক্ষণ একটানা গুলিবর্ষণের পর আবার বিরতি। খানিক পর শোনা গেল রাজু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। হাসপাতালের নেয়ার পথে রাজু মারা যায়।

রাজুর মৃত্যু সংবাদে ক্যাম্পাসে সবার মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্যাম্পাসের চারদিকে ভৌতিক পরিবেশ।

রাজুর মৃত্যুর পর সে রাতে হলে ফিরে আমার মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ, গ্লানিবোধ কাজ করতে থাকে। রাতেই সিদ্ধান্ত নেই, সকালে রাজুর শোক মিছিলে যাব।

১৪ মার্চ। সকালের সোনারঙা রোদে চারদিক ঝলমল করছে। অন্যান্য দিনের মতোই ক্যাম্পাসে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের সরব উপস্থিতি। দেখে বোঝার উপায় নাই আগের দিন এক তরুণ ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বর। কলাভবনের সামনের মাঠে গাছের ছায়ায় যথারীতি গোল হয়ে বসে ছেলেমেয়েরা আড্ডা দিচ্ছে। বাইরে চটপটি আর ফুচকার দোকানের সামনে মেয়েদের ভিড়। শত শত ছেলেমেয়ের কোলাহল আর পদচারণায় কলাভবন গমগম করছে। আগের দিনের ঘটনার পর ক্যাম্পাসে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ভিসির বাড়ির সামনে তিন লরী পুলিশ। কলাভবনের পাশের মলে পুলিশের অবস্থান। মধুর ক্যান্টিনের সামনেও দাঁড়িয়ে আছে এক ট্রাক পুলিশ। পুলিশের ব্যাপক সমাবেশের জন্যই মনে হয় ক্যাম্পাসে স্বস্তির পরিবর্তে যেন একটু সন্ত্রস্ত পরিবেশ।

তখন সকাল দশটা। মধুর ক্যান্টিনের সামনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা এসে একে একে জড়ো হচ্ছে। একটু পর রাজুর জানাজা হবে। তারপর বেরুবে শোক মিছিল। মধুর ক্যান্টিনের সামনে কালো কাপড়ের ব্যানার ঝুলছে। একে একে আসছে রাজুর সহপাঠীরা, বন্ধুবান্ধব। সবার মুখে বিষাদের ছায়া।

জানাজা শেষে সকাল এগারটায় বের হলো শোক মিছিল। দীর্ঘ মিছিলের সামনে লম্বা বাঁশের মাথায় ঝুলে আছে শোকের কালো পতাকা। বুকে কালো ব্যাজ আঁটা শোকার্ত ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলের অনুগামী। কিন্তু খানিক পর শোক মিছিল আর শোক মিছিল থাকলো না। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ক্রুদ্ধ গর্জনে তা পরিণত হলো বিক্ষোভ মিছিলে।

স্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ মিছিল লেকচার থিয়েটারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনই গুলি হলো। মনে হলো কেউ যেন আমার কানের পাশ থেকে গুলি করলো। প্রথমে সিঙ্গেল শট, পরে ব্রাশ ফায়ার। মুহূর্তের জন্য কেউ যেন আমার হৃদযন্ত্রের [illegible] থামিয়ে দিল। ছত্রভঙ্গ মিছিল ঘুরে দৌড় দিয়েছে উল্টো দিকে। মাঠের মধ্যে বসে থাকা ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট জটলাগুলো মুহূর্তে অদৃশ্য। দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সবাই ছুট লাগিয়েছে এদিক-সেদিক। মাঠের শেষে লোহার গ্রীল টপকাচ্ছে একটা মেয়ে। সঙ্গের ছেলেটা দৌড়ে সামনে গিয়ে আবার ফিরে এলো তাকে নেয়ার জন্য।

ভিসির বাড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিশের দল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। টপ টপ করে উঠে পড়লো লরীতে। তারপর ঝড়ের গতিতে পুলিশের লরীগুলো ছুটে গেলো টিএসসির দিকে।

গোলাগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলে আসি কলাভবনের সামনে। কলাভবনের গেটে ততক্ষণে হুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে। একদল আতংকিত ছাত্রছাত্রী রক্তশূন্য মুখে দৌড়ে ঢুকছে ভেতরে। অন্যরা কি ঘটেছে জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

গেটের কাছের ভিড় ঠেলে আমি কোনরকমে ঢুকে পড়ি কলাভবনের মধ্যে। বুকের মধ্যে ধপধপ শব্দ। কেউ যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। জীবনে এত ভয় পাইনি।

বাইরে তখনো গোলাগুলি হচ্ছে। গেটের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা সবে এলো ভেতরে। হুড়মুড় করে সবাই উঠতে চাচ্ছে দোতলায়। আমিও দোতলায় এসে ডিপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়াই। করিডোরে দেখলাম কয়েকটা মেয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। কৌতূহলী কয়েকটা ছেলে রেলিং-এর উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে নিচের অবস্থা। একটু আগে যে সবুজ চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের মেলা বসেছিল এখন তা ফাঁকা, প্রাণহীন। সামনের রাস্তায় পুলিশের লরীগুলো আবার ফিরে এসেছে।

একজন শিক্ষক বাইরে এসে ছেলেমেয়েদের ধমক লাগালেন। ভেতরে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বললেন সবাইকে। এসময় কলাভবনের মধ্যে আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। এবার কলাভবনের ভেতর থেকেই গুলির শব্দ। সবাই দৌড়ে ঢুকে পড়লো এক ক্লাসরুমে। দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। করিডোরে দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দ। ভেতরের সবার নিশ্বাস পড়ছে হাঁপরের মতো। দরোজায় হঠাৎ ধাক্কা। বাইরে থেকে আতংকিত কণ্ঠ-দরজা খুলুন। একজন এগিয়ে যায় দরজা খুলতে, কয়েকজন ধমক দেয়, না দেখে দরজা খুলবেন না। বাইরে থেকে দরজায় আবার অসহিষ্ণু অধৈর্য ধাক্কা। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে।

বন্ধ ঘরের মধ্যে নানা রকম কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে। বাইরে তখনো গোলাগুলি হচ্ছে। একজন জানালো পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে। একটু পরে জানালা দিয়ে টিয়ারগ্যাস ঢুকতে শুরু করলো ভেতরে। সবার চোখ জ্বালা করছে। একজন চিৎকার করে উঠলো-রুমাল ভিজিয়ে চোখে দিন। দরোজা খুলে আমরা কয়েকজন ছুটে যাই বাথরুমের দিকে। আর তখনই টিয়ারগ্যাসের আরেকটি শেল এসে পড়ে কলাভবনের করিডোরে। ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারদিকে আর্ত চিৎকার। কয়েকটি মেয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমি ছুটে চলে আসি কলাভবনের পেছনের ব্লকে। এদিকে ধোঁয়া কিছুটা কম। বাথরুমে গিয়ে পানির ঝাঁপটা দেই চোখে মুখে।

গোলাগুলি যখন থামে, বেরিয়ে আসি বাইরে। কাঁদানে গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় সবার চোখ লাল। সন্ত্রস্ত ক্যাম্পাসে তখন আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে কলগুঞ্জনের সাড়া। তারুণ্যের স্পন্দনতো আর থেমে থাকে না।